বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
১০৪ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা মঙ্গলবার ২১ পৌষ ১৪৩২ কলকাতা

দ্বেষপ্রেম

বর্তমান ভারতে, বলিউড এবং ক্রিকেট, আমজনতার সর্বাধিক আগ্রহের দু'টি বিনোদনই এখন রাজনৈতিক। দেশের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, তার সঙ্গে এগুলি সরাসরি যুক্ত। বাংলাদেশি খেলোয়াড় মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল-এ খেলা নিয়ে যে কুনাট্য অভিনীত হল, প্রকৃতপক্ষে তা রাজনীতির সর্বগ্রাসেরই এক মোক্ষম উদাহরণ। রাজনীতির এই গ্রাস বহুস্তরীয়। প্রথমত, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে কূটনৈতিক অস্থিরতা চলছে, তাকে পর্যবসিত করা হল দেশপ্রেমের প্রশ্নে। গত বছর থেকেই বাংলাদেশে ভারত-বিদ্বেষী সুর ক্রমাগত চড়ছে, কিন্তু ভারতের ক্রিকেট-সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হয়তো তা নয়। প্রধান কারণ হল, বাংলাদেশে এখন হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা আগের থেকে অনেক বেশি বাড়ছে, প্রকাশ্য হচ্ছে। যে যে ঘটনা সেখানে ঘটছে, তা সত্যিই ভয়ঙ্কর। প্রতিবেশী দেশের সমাজে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে তার প্রকাশ্য নিন্দা এবং প্রয়োজনে অন্য কোনও পদক্ষেপ করাই উচিত। কিন্তু সেই পদক্ষেপ হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক কূটনীতির স্তরে। অথচ দেখা গেল, এই প্রশ্নে উগ্র দেশপ্রেম জাগানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সংশয় হয়, হিন্দু রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বরকে এখন জাতীয় সুর হিসাবে বিবেচনা করে সমাজে ও ঘরোয়া রাজনীতিতে তাকে কেন্দ্র করে তুফান তোলার উদ্দেশ্যেই ভারতের মুস্তাফিজুর সিদ্ধান্ত। এর উত্তরে, বাংলাদেশ যে ভঙ্গিতে টি২০ বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে না-আসার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, তা-ও একই রকম বিদ্বেষপ্রসূত। প্রশ্ন হল, ভারত যদি বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের মতোই হতে চায়, তবে তাদের সমালোচনা করে কোন যুক্তিতে?

দ্বিতীয় স্তরে বলা যায়, ক্রিকেটের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘দেশপ্রেম’-এর গুরুভার। খেলার শেষে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত না-মেলানোর মতো অসৌজন্যে তার প্রকাশ। বাংলাদেশের খেলোয়াড়কে আইপিএল থেকে বাদ দিতে বলা আর একটি। ‘খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি’ নামক কথাটি এখন অতীত— ফলে, যে দ্বন্দ্বের সমাধান হওয়ার কথা কূটনীতির পরিসরে, প্রয়োজনে বহুজাতিক মধ্যস্থতার সাহায্যে, সেই ‘যুদ্ধ’ এখন ক্রিকেট মাঠেও ঢুকে পড়েছে। কেন ক্রিকেট বা বলিউডের সিনেমা এমন উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রদর্শনী হয়ে উঠল, সে কারণটি বোঝা কঠিন নয়— এই দু'টি মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে সহজে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় বিদ্বেষের বার্তা। দুর্ভাগ্যজনক, বহু অভিনেতা/নির্দেশক বা খেলোয়াড়ই এই বিদ্বেষের স্বেচ্ছা-বাহক। নিজেদের পেশায় তাঁরা যে জনপ্রিয়তা ও প্রভাব অর্জন করেছেন, তাকে এই উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহৃত হতে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, বরং বিশেষ আগ্রহ আছে।

তৃতীয় স্তরে দেখা সম্ভব, রাষ্ট্রীয় মদতপ্রাপ্ত এই বিদ্বেষের রাজনীতি কী ভাবে দখল করে নিচ্ছে বাজারকেও। আইপিএল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিসিসিআই কোনও সাংবিধানিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়, তা এক ক্রীড়া প্রশাসক সংস্থামাত্র। তার পরিচালিত হওয়ার কথা ক্রিকেটের বাজারের ধর্ম অনুসারে। অবশ্য, সে সংস্থা কী ভাবে চলে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। বিসিসিআই আইপিএল-এর এক ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি কেকেআর-কে বলল, মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে। কেকেআর টুঁ শব্দটি না-করে নির্দেশ পালন করল। খেলোয়াড় হিসাবে মুস্তাফিজুরের মূল্য কতখানি, সে প্রশ্ন বিবেচনায় আসেনি বলেই অনুমান করা যায়। তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করল না, তার একটি কারণ রাজনৈতিক চাপ; কিন্তু অন্য কারণ বাজার। রাজনৈতিক বিদ্বেষের বার্তা এমন ভাবে দর্শকদের মনে ঠাঁই পেয়েছে যে, বোর্ডের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মুস্তাফিজুরকে খেলালে তার তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এক রকম অনিবার্য ছিল। সযত্নে রোপণ করা ও লালন করা বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ এখন ফলের ভারে নুয়ে পড়ছে। সেই ফল আস্বাদন করাই এখন ভবিতব্য।

প্রাণবায়ু

বায়ুদূষণকে কি কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা যায়? গত কয়েক বছরে স্পষ্ট, দীপাবলির সময় থেকে দেশের রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাতাসের গুণমান মারাত্মক খারাপের পর্যায়ে চলে যায় হামেশাই। সেই পর্যায়গুলিতে রাজধানীতে চালু হয় ‘গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান’ (জিআরএপি)। কিন্তু দেশের অন্য দূষিত শহরগুলিতে তার প্রয়োগ হতে দেখা যায়নি। অথচ, বায়ুদূষণ শুধু দিল্লির ক্ষেত্রেই নয়, সার্বিক ভাবে জনস্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সম্প্রতি জাতীয় পরিবেশ আদালতের কাছে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালত-বান্ধবের জমা পড়া রিপোর্টটি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যথার্থ ভাবেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কেন বায়ুদূষণ সংক্রান্ত বিশেষ কঠোর নিয়মবিধি শুধুমাত্র রাজধানী দিল্লির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? কেন দেশের অন্য দূষিত শহরগুলির জন্য তা কার্যকর করা যাবে না?

জিআরএপি মূলত একগুচ্ছ আপৎকালীন নিয়মবিধি, যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর বাতাসের গুণমানকে আরও খারাপ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। এর বিভিন্ন স্তর আছে। দিল্লিতে একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা বায়ুর গুণমান সূচক) ২০০ পেরোলেই রাস্তায় যানবাহন চলাচল মসৃণ করা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ (যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প উৎসগুলির ব্যবহার কমে), জনগণকে বায়ুদূষণ সম্পর্কে সচেতন করা প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া হয়। একিউআই মারাত্মক খারাপ-এ পৌঁছলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জিআরএপি প্রয়োগ করা হয়, যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, অফিসগুলিতে বাড়ি থেকে কাজ চালু প্রভৃতি পদক্ষেপ করা হয়। সমস্যা হল, বায়ুদূষণের ক্ষেত্রটিতে দিল্লি এক অনন্য নজির গড়লেও ভারতের অন্য একাধিক শহরও দূষণ-তালিকায় খুব পিছিয়ে নেই। এ বছরের শুরুতেই কলকাতার বাতাসে বিষের পরিমাণ যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অথচ, এই শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে তেমন চর্চা কই? অনেকটা একই অবস্থা দুর্গাপুর, আসানসোল, রানিগঞ্জ এবং হলদিয়ারও। ইতিমধ্যেই এই শহরগুলি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাপকাঠি অনুযায়ী টানা পাঁচ বছর বাতাসের জাতীয় গুণমান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ, এখানে বায়ুদূষণ বিষয়ে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

জিআরএপি-কে দিল্লির বাইরে সম্প্রসারিত করা যাবে কি না, তা আইনি লড়াইয়ের প্রশ্ন। কিন্তু বায়ুদূষণ রোখার যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্মত নিয়মগুলি আছে, তা কেন কলকাতা-সহ রাজ্যের দূষিত শহরগুলিতে দেখা যায় না, সে প্রশ্ন তোলা জরুরি। কেন আতশবাজির দূষণকে ঠেকানোর কোনও উদ্যোগই করা হয় না, পরিবেশ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও? জনস্বাস্থ্যের বিপদকে পিছনে ঠেলে কেন বার বার বাজি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে সরকার? যেখানে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বা বিদ্যুচ্চালিত বাসের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা, সেখানে পনেরো বছরের মেয়াদ পেরোনো গণপরিবহণ চালানোর দাবিকেও মেনে নেওয়া হয় এই রাজ্যে। প্রকাশ্যে আবর্জনা পোড়ানো, ভাগাড়ে অবৈজ্ঞানিক ভাবে জমতে থাকা জঞ্জাল, অবাধ নির্মাণকাজ— প্রশাসন কোনটিতেই বা কঠোর লাগাম পরিয়েছে? দূষণক্লান্ত শহরে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নির্মিত জিআরএপি-র প্রয়োজন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার আগে সহজলভ্য ওষুধটুকুর অবিলম্বে প্রয়োগের ব্যবস্থা হোক।

মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে ‘মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্প’

যেন অনুদান নয়, ভিক্ষা

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

যে যেখানে লড়ে যায়, তা আমাদেরই লড়াই হলেও হতে পারে। কিন্তু যে যেখানে জিতে যায় তাকে আমাদের জয় বলে খুশি হওয়া কতটা যথাযথ? গত বছর ২ নভেম্বর মধ্যরাতে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বজয়ের পর থেকে যে অভিনন্দনের স্রোত বইছে, তার এক পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন কিন্তু কারও কারও মনে গভীর হয়ে বাজছে যে, এই জয় সামগ্রিক ভাবে ‘মেয়েদের’ কতটা এগিয়ে দিল? প্রশ্নটা সহজ, উত্তরও জানা। মেয়েদের এই ক্রিকেট বিশ্বকাপ কবে শুরু হয়েছিল, আমরা জানতাম না; প্রথম দিকের খেলাগুলোর হারজিত আমরা খেয়ালও রাখিনি। ভারতীয় দল সেমিফাইনালের আগে হেরে বিদায় নিলে এই ‘মেয়েদের খেলা’ নিয়ে আমাদের কিচ্ছু এসেও যেত না। তাই আমরা যা উদ্‌যাপন করছি, সেটা আসলে ভারতের সাফল্য। এর সঙ্গে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে মেয়েদের ওঠাপড়া বড় একটা সম্পর্কিত নয়।

এই কথাটা মেয়েদের বার বার ঠেকে শিখতে হয় জীবনভর। নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি— এই সব নিয়ে কথা বলতে গেলে এক ঝলকে যে মেয়েদের ছবি চোখে ভেসে আসে, শুধু সেই অসহায় মেয়েদের কথাই বলছি না, তাঁদের থেকে বহু দূরের আলোকিত বৃত্তে বাস করেন যে উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা, কথাটা তাঁদের ক্ষেত্রেও একই রকম সত্যি। ছেলেদের পাশাপাশি একই ভাবে পড়াশোনা (এবং গবেষণা) শেষ করার পর সংসারজীবন ও মাতৃত্বের আঙিনায় প্রবেশ করে প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই এই মেয়েরা অনেকে পুরুষ সহকর্মীদের থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েরা কোনও চাকরিতে না ঢুকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার (বিজ্ঞান) জগতেই থাকার স্বপ্ন দেখেন, সেই মেয়েদের জন্য এই শতকের শুরুর দিক থেকেই (২০০১) কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কিছু প্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর (ডিএসটি)-এর ‘মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্প’। সাংসারিক কারণে যে সব মহিলা ‘কেরিয়ার’-এর দৌড়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন, তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার (ঠিক এই কথাটাই লেখা আছে) মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সিকি দশক পরে এই প্রকল্পগুলির কী হাল?

এই সময়কালের মধ্যে বার বার নাম (প্রথমে ‘দিশা’, পরে ‘কিরণ’), উদ্দেশ্য ও বিধেয় বদলে ‘মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্প’ আজ যেখানে দাঁড়িয়েছে, সে কথাটা আগে বলি। এক-একটা তিন বছরের প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু মহিলাকে পিএইচ ডি করার সুযোগ দেওয়া, যাঁদের পিএইচ ডি ডিগ্রি আছে, তাঁদের গবেষণাবৃত্তি ও গবেষণার খরচ চালানোর জন্য কিছু অনুদান দেওয়া ছিল এই প্রকল্পের (ডব্লিউওএস-এ) মুখ্য কার্যক্রম। এ ছাড়াও বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব আছে এমন কাজের (ডব্লিউওএস-বি) জন্য বৃত্তি ও অনুদান দেওয়াও এর আওতায় পড়ে। মোটের উপরে একটা চাকরির সমমানের বৃত্তি এবং প্রায় সব বয়সের মহিলাদের জন্য কিছু গবেষণার সুযোগ ছিল প্রকল্পের অন্তর্গত। কিন্তু প্রথম কয়েক বছর পর থেকেই এই প্রকল্প তার বৃহত্তর উদ্দেশ্য থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। দেখা গিয়েছে, যাঁরা পিএইচ ডি করতে চাইছেন, এই প্রকল্প মূলত তাঁদেরই সাহায্য করছে, পরবর্তী ধাপের গবেষকদের জন্য বরাদ্দ অনুদান ক্রমাগত অনিয়মিত হয়ে পড়ছে। অথচ পিএইচ ডি ডিগ্রি না-পাওয়া অবধি এক জন গবেষককে প্রচলিত অর্থেও বিজ্ঞানী বলা যায় না। সেই জন্যই পিএইচ ডি-র আগে গবেষকের গবেষণা বৃত্তি ও অনুদান, দুই-ই অনেক কম। সে দিক থেকে যাঁরা ডিগ্রি পেতে চাইছেন, আর যাঁরা স্বাধীন গবেষণা করতে চাইছেন, তাঁদের একই নামের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করাটা প্রাথমিক ভাবে এই পরিকল্পনার একটা ত্রুটি। কিন্তু এই ত্রুটিকে ব্যবহার করেই মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্প ‘সুলভ মূল্যে’ খাতায় কলমে চালু আছে, ‘আউটকাম’ কেন্দ্রিক বর্তমান জমানায় কিছু পিএইচ ডি উৎপাদন করছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মহিলা বিজ্ঞানী যাঁরা, তাঁদের উপর থেকে সাহায্যের হাত তুলে নিচ্ছে। কাজ শুরুর সময় থেকে তিন বছরে তিন ধাপে টাকা আসার বদলে মাত্র এক বা দু'বার টাকা আসছে। এক জন মহিলা যে কাজের পরিকল্পনা করে দরকারি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সব কিছুর দাম ধরে একটা হিসাব পাঠিয়েছেন, টাকার অভাবে তিনি কিছুই না কিনতে পেরে শুধু মাসের মাইনেটুকু নিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই হাল চলেছে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আর এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানী নামধারী এক জন উচ্চশিক্ষিতা পেশাদার কার্যত এক জন সীমিত সময়ের ভাতাধারীতে পরিণত হয়েছেন। কাজের মধ্যে দিয়ে মূলধারায় ফিরে আসার যে স্বপ্ন তাঁদের দেখানো হয়েছিল, তাও একবারেই সফল হয়নি। এই পরিকল্পনার গোড়াতেই অনেক গলদ ছিল যেগুলো সংশোধন করে নিলে এই প্রকল্প মহিলাদের বিজ্ঞানের গবেষণায় লেগে থাকার পক্ষে সত্যিই সহায়ক হয় উঠতে পারত; সে বিষয়ে *কারেন্ট সায়েন্স* পত্রিকায় (২৫ অক্টোবর, ২০১৬) আমাদেরই লেখা একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাবে শুধু নিয়মরক্ষার চক্রে পড়ে প্রকল্পটি পুরোপুরিই দিশা হারিয়ে ফেলল।

নিয়মরক্ষার মুখোশও ইদানীং অটুট থাকছে না। বছর দুই আগে যাঁদের ডব্লিউওএস-এ ‘প্রোজেক্ট’ শুরু হয়েছিল, প্রথম দফার অনুদানের পর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফলে মাসের মাইনেটুকুও আর আসছে না। এমনকি যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মহিলা বিজ্ঞানীরা নিজেদের নথিভুক্ত করে প্রোজেক্ট পাঠিয়েছেন, যেখানে তাঁর প্রোজেক্টের সব তথ্য রাখা থাকে, সেই সাইটই আর খোলা যাচ্ছে না। এর মধ্যে ডিএসটি নাম বদলে ‘অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ (এএনআরএফ) হয়েছে। কিন্তু তার জন্য আগে থেকে চালু ‘প্রোজেক্ট’গুলো বন্ধ হয়ে যাবে— এমন কিছু বলা হয়নি। আর দেড়-দুই বছর আগে থেকে ডব্লিউওএস (‘এ’ আর ‘বি’, দুই-ই) প্রোজেক্ট পাঠিয়ে আবেদন করে ইন্টারভিউ দিয়ে যাঁরা অপেক্ষা করেছেন এখনও তাঁদের ফলাফলই জানানো হয়নি। অর্থাৎ, সাংসারিক কারণে যাঁরা গবেষণায় পিছিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার নামে এই ভাবে বছরের পর বছর বসিয়ে রাখা যায়, কিংবা কিছু না বলে মাইনেটাও বন্ধ করে দেওয়া যায়, যেন এটা অনুদান নয়, ভিক্ষা! গবেষকদের অভিজ্ঞতা বলে, ডিএসটি-র তরফে ফল প্রকাশে বা টাকা পাঠানোয় ছ'মাস থেকে আঠারো মাস দেরি প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু এ বার যা হচ্ছে সেটা নতুন।

সব প্রশ্নের উত্তরে ডিএসটি একটি কথাই সবাইকে বলে, ‘অনুদানের অভাব’। কিন্তু এই পরিকল্পনার খাতে ধারাবাহিক ভাবে অনুদানের এতটা অভাব কেন? ডিএসটি বিভিন্ন প্রোজেক্টে তো অনেক বেশি অনুদান দেয় (যদিও ক্রমহ্রাসমান), এখানে নয় কেন? কারণ মেয়েদের এগোতে সাহায্য করাটা সরকারের কাছে অগ্রাধিকার তো পায়ই না, কিছুটা বাজে খরচের মতো দেখা হয়। কিন্তু এতটা আর্থিক দৈন্য নিয়ে একটা পরিকল্পনা কী ভাবে চালু থাকে, চালু থেকে লাভ কী, তারও কি উত্তর আছে? যাঁরা পিএইচ ডি-র জন্য গবেষণা শুরু করেছেন, প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে এই প্রোজেক্টে আবেদন করলে তাঁদের তবু বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু যাঁরা তৃতীয় বছরে আবেদন করেছেন, তাঁদের তো বৃত্তি মঞ্জুর হয়ে হাতে আসতে পিএইচ ডি শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিজ্ঞানের গবেষণা শুধু বৃত্তিটুকুই নয়, অন্যান্য খরচ আছে, যে কারণে এই প্রোজেক্টের কথা ভাবা হয়েছিল। সেই খরচ আসবে কোথা থেকে?

মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্পের ‘বেটি’-রা উচ্চশিক্ষিতা, গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতিতে তাঁদেরও ভূমিকা থাকতে পারে। কিন্তু গবেষণা তো ক্রিকেট-ফুটবলের মতো কোনও তাক লাগানো ব্যাপার নয়। তার যুদ্ধ অন্য রকম, সাফল্যও অমন চমকদার, ঝলসে ওঠার মতো হয় না। তার উপর সাংসারিক দায়িত্বে কিছুটা বিপর্যস্ত, গবেষণার মূলধারা থেকে সরে যাওয়া মেয়েরা যদি এই রকম ‘সহায়তা’ পান, তা হলে তাঁদের পক্ষে গবেষণায় কতটা এগোনো সম্ভব, সহজে অনুমেয়। মহিলা বিজ্ঞানী প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে মহিলাদের প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েই যাচ্ছিল, আপাতত বিলীন হয়ে গিয়েছে। লড়াই শুরুর আগেই তাঁরা হেরে যাচ্ছেন আর দিনের শেষে তাঁদের বৃত্তিও স্রেফ ‘পয়সা’ হিসেবেই ভাবা হচ্ছে। প্রায় এক দশক আগে যিনি এই প্রকল্পের হতাশাজনক দিকটির কথা তুলে ধরেছিলেন (‘মেয়েরা সংসার করবে, বিজ্ঞানীও হবে?’ ২৭-১০-১৬), এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েও তিনি আজ আরও হতাশার কথাই লিখতে বাধ্য হলেন। এটাই দুঃখ।

রসায়ন বিভাগ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

হিজাব, যে যেখানে দাঁড়িয়ে

ঈশা দাশগুপ্ত

তিন দশক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি চলচ্চিত্রে প্রায় একই রকম দৃশ্য ছিল। তার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, দৃশ্যটিও মূলত হাস্যরসাত্মক। নায়িকা, নায়িকার বান্ধবী দু'জনেই একই রঙের বোরখা, হিজাব ও নিকাব পরিহিতা, তাই উপায়ান্তর না দেখে, নিকাব তুলে দেখছেন নায়ক।

এই দৃশ্য নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। ছবিটি কিছু দিনের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, পরিচালকের উপরেও বোমা আক্রমণ হয়। ছবিটির নাম বম্বে, পরিচালকের নাম মণিরত্নম। হিন্দু মুসলিম প্রেম, বিয়ে ও বাবরি মসজিদ দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদনশীল এক উপস্থাপনা। হিজাবের দৃশ্যটি ছাড়াও এর মূল বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল, তাই সেই সময়ের ইন্টেলিজেনশিয়া বা বৌদ্ধিক সমাজ মণিরত্নমের পক্ষে ছিল।

এ বার ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বিহারের শংসাপত্র প্রদানের অনুষ্ঠানের দিকে তাকানো যাক। ঘটনাটি এত দিনে জানা, তবু বিস্ময়ের শেষ হয় না। ডাক্তারি পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে যে ছাত্রী, সে হিজাব পরে থাকুক অন্য কোনও ধর্মীয় পোশাক পরে থাকুক, তাতে কি সত্যিই কিছু যায় আসে? তবু নিজের পক্ষে রসিকতার যুক্তি দিয়েছেন নীতীশ কুমার। বলেছেন, আলাদা করে কাউকে বিব্রত করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। ছাত্রীটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তাই মজার ছলে হিজাব সরিয়েছিলেন তিনি।

মজা করেও কি কারও পোশাকের কোনও অংশ স্পর্শ করা যায়, সরিয়ে ফেলা যায়? মুসলমান ছাত্রীটির হিজাবের সঙ্গে কি অমুসলিম ছাত্রীর পোশাকের সঙ্গে ওড়না বা চুনরি ব্যবহারের তুলনা করা যেতে পারে না? তার দেহ থেকে সেই ওড়না কি শুধু ‘মজার ছলে’ টেনে নেওয়া যায়?

আর যদি সেই পোশাকের সঙ্গে যুক্ত থাকে ধর্মীয় ভাবাবেগ? পুরুষ ছাত্রের প্রথা বিশেষে ব্যবহৃত পাগড়ির সঙ্গে তুলনা করা চলে। সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছাত্রের পাগড়ি কি খুলে নিতে পারতেন নীতীশ কুমার? দাঙ্গা পরিস্থিতির ভয়ে, বা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের ভয়ে পিছিয়ে যেতেন না কি? কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনও উত্তেজনাই হল না। প্রতিবাদ হয়তো হল কিন্তু তত কিছু নয়। সাহস যে কেউ পেল না, তার কারণ কি মেয়েটির লিঙ্গপরিচয় এবং ধর্মপরিচয়?

অদ্ভুত সমাপতন। প্রায় একই সময়ে কলকাতাতেও ঘটল একই রকম ঘটনা। প্রেক্ষিত আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য সেই মুসলিম ছাত্রী। বারংবার বলা হচ্ছে, অধ্যাপিকা ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন ছাত্রীটির হিজাব খুলে পরীক্ষা করার আগে। তাকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়েও এই প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এও যেন নীতীশ কুমারের রসিকতার যুক্তির মতো। ক্ষমা স্বীকারে অধ্যাপিকার ব্যক্তিগত অন্যায় ব্যবহারের ভার লাঘব হয় ঠিকই, কিন্তু হিজাব খুলে ছাত্রীটিকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত তো ব্যক্তিগত হতে পারে না, প্রাতিষ্ঠানিক হতে হয়। প্রতিষ্ঠান ক্ষমা স্বীকার করেছে কি?

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে থাকার সুবাদে বিষয়টির সঙ্গে কম পরিচিতি নেই। দেখেছি, প্রথমেই হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন অনেকে। “ওই মেয়েগুলোর দিকে বেশি করে নজর রাখিস।” কেন রাখব? তার পোশাক কেন পাশের মেয়েটির সালোয়ার-কামিজ বা টিশার্ট জিন্‌স-এর সঙ্গে একই দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে না? সংবিধানের ধর্মীয় সাম্যের ধার লঙ্ঘিত হবে কেন?

প্রতিযুক্তিতে কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপক হয়তো বলবেন, তাঁরা কখনও এ রকম কোনও ছাত্রী হয়তো পেয়েছেন, যারা তাদের বিশেষ পোশাকের সুবিধা নিয়েছিল। হিজাবের মধ্যে থেকে হয়তো আবিষ্কৃত হয়েছিল নকল করার কাগজ। তা তো আবিষ্কৃত হয়েছে হিজাব না-পরা ছাত্রীর ক্ষেত্রেও। তবু হিজাব পরা ছাত্রীটির কথাই বলা হবে।

মনে পড়ে যায় ওরহান পামুকের *স্নো* উপন্যাসটির কথা। তুর্কিয়ে দেশে কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের পরে মহিলাদের হিজাব না পরার স্বাধীনতা দেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতাই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক। যে মেয়েরা হিজাব পরিধান করতে চাইছে, তারা সরকার ও প্রশাসনের রোষের মুখে পড়ে। কোনও স্বাধীনতা বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে তা আর স্বাধীনতা থাকে না, এই কথা তো অমর্ত্য সেনই বলেছেন। প্রিয় বই বন্দুকের নলের সামনে বসে পড়তে হলে সেই বই আর প্রিয় থাকে না।

তাই বিষয়টি কোনও ধর্ম পর্দাপ্রথা সমর্থন করে বা করে না-র নয়— বিষয়টি যিনি ঘোমটা বা বোরখা ব্যবহার করছেন তার ইচ্ছে বা অনিচ্ছের। খুব রোদে আমি বা আপনি মাথায় ঘোমটা দিলাম, আমাদের ইচ্ছা। তেমনই মেয়েটির হিজাব পরিধানও হতেই পারে তার ইচ্ছে। কেউ তাকে বাধ্য করেনি। অবশ্যই সামগ্রিক পিতৃতন্ত্র ও তার থেকে সৃষ্ট প্রথার মনস্তত্ত্বের উপরে প্রভাব তা হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা অস্বীকার করা চলে না। আমি বা আপনি হয়তো পিতৃতন্ত্রের প্রভাবেই সিঁদুর ঠেকাই কপালে, আধুনিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করে প্রায় অদৃশ্য রাখি সেই পালন। আমাকে আপনাকে কেউ প্রত্যেক দিন জোর করে না। ছাত্রীটিকেও রোজ কেউ হিজাব পরতে জোর করে না। লুকিয়ে থাকা পিতৃতন্ত্রের প্রভাব তার মধ্যে থাকা সম্ভব, আপনার-আমার মতোই। কিন্তু আমাদের থেকে সে তবু আলাদা, হিজাবের জন্য তাই তাকে প্রতি দিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।

‘হিজাব’ ওদের মেয়েদের, ‘আমাদের’ মেয়েদের নয়, এই ওরা-আমরা হিসাবের মধ্যেই আমরা তলিয়ে যাব, আরও বেশি করে?

■ দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in
অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

বিপরীত পথের ফল

মোহিত রায়ের লেখা ‘বাস্তবে ফেরার সময়’ (১০-১২) প্রসঙ্গে কিছু কথা। জীবাশ্ম-জ্বালানির অপরিকল্পিত ব্যবহার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার— মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, কয়েক বছরেই কোকিং কয়লা খনি (১৯৭১ সালে অধিগ্রহণের পর) জাতীয়করণ এবং ১৯৭৩ সালে নন-কোকিং কয়লা খনির জাতীয়করণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়লা উত্তোলন সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকলে পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে দারিদ্র-দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজটাও সহজসাধ্য হয়। ইদানীং জাতীয়করণের বদলে সরকার-অধিগৃহীত সংস্থা কর্পোরেটকরণের প্রবণতাই সরকারি পরিকল্পনায় বেশি করে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে ২০১৪ থেকে বেসরকারিকরণ হয়েছে প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম, টেলিযোগাযোগ, বেসরকারি বিমান পরিষেবা, খনির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। এই বিপরীত পথে হাঁটার ফলে সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ ও সুরক্ষা প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে। কর্পোরেটকরণের সঙ্গে দারিদ্র ও পরিবেশ দূষণ কিন্তু সম্পর্কহীন নয়।

প্রবন্ধকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষায় চিনের পথে হাঁটতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সে-ক্ষেত্রে কাজটা করতে হবে “চিনের একনায়কতন্ত্রকে বর্জন করে”। কিন্তু একটি সর্বাত্মক ভাবে ‘টোটালিটারিয়ান’ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো বর্জন করে তার উন্নয়ন কাঠামো গ্রহণ করার পদ্ধতিটা তিনি ব্যাখ্যা করেননি! ভারতের উন্নয়ন কাঠামো প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতান্ত্রিক’ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দু'টি সংযোজন করায় ভারত ‘সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’-এ রূপান্তরিত হয়। এই পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় কল্যাণকামিতা, ধর্মীয় নিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রের গভীর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, ফলে একটি সুদৃঢ় উন্নয়ন কাঠামোর পথ প্রশস্ত হয়।

জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবসায় কয়েকটি ভারতীয় কর্পোরেট-এর আধিপত্য ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দে আপত্তির কারণ অনুমেয়। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে জীবাশ্ম-জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসার সুযোগ করে দিতেই কি ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটিতেও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের এ-হেন আপত্তি? বিশেষত শব্দটি কিন্তু কর্পোরেট স্বার্থবিরোধী বলে অনেকেরই ধারণা।

অনিরুদ্ধ রাহা
কলকাতা-১০

বিশাল ফাঁক

মোহিত রায়ের লেখা ‘বাস্তবে ফেরার সময়’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গে কিছু কথা। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে নীতি ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বড় ফাঁকই হল মূল সমস্যা। আসলে কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জ্বালানি-নির্ভর অর্থনীতি। ভারতে মোট শক্তির ৭০ শতাংশেরও বেশি কয়লা, তেল ও গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নীতিগত দিক দিয়ে যথার্থ হলেও গ্রিড ব্যালান্সিং, শক্তি সঞ্চয়ের প্রযুক্তি এবং শক্তির সঞ্চালনের উন্নত পরিকাঠামো ছাড়া তার বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব।

পরিবহণখাত দ্বিতীয় বৃহত্তম দূষণকারী। প্রতি দিন শহরে বিপুল ‘সচল ঘণ্টা’ নষ্ট হয়, যার প্রায় ৪০ শতাংশই ঘটে যানজটজনিত অদক্ষতার কারণে। গাড়ি ‘চালু-বন্ধ’ করার প্রবণতা কার্বন নিঃসরণ তিন থেকে পাঁচ গুণ বাড়ায়— এই তথ্যকে নীতিনির্ধারকেরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। গণপরিবহণের অভাব, সাইকেল চলাচলের পথ না থাকা, শহর পরিকল্পনায় হাঁটার উপযোগী পথের ঘাটতি— এ সবই পরিবহণ খাতে কার্বনের ব্যবহার না কমার কারণ। শহুরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অপ্রতুল ভাবে ব্যবহৃত। জৈব ও অজৈব বর্জ্য পৃথক না করলে মিথেন নিঃসরণ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। মিথেন উষ্ণায়নের কারণ। তা কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় ২৮-৩৬ গুণ বেশি তাপ ধারণ করে।

পরিবেশ নীতিকে সফল করতে নাগরিকের আচরণগত পরিবর্তনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনঅভ্যাস না বদলানোর কারণে ৩০-৪০ শতাংশ পরিবেশ আইন ব্যর্থ হয়। মানুষ যতক্ষণ না বিদ্যুৎ সাশ্রয়, গণপরিবহণ ব্যবহার, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, বর্জ্য আলাদা করা— এ সব অভ্যাসে পরিণত করছে, তত ক্ষণ আইন কাগজেই থেকে যাবে।

অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

কেন দুর্ভেদ্য

যোগেন্দ্র যাদব ‘আসল লক্ষ্য বাংলা’ (৮-১২) প্রবন্ধে লিখেছেন, “...পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে সাম্প্রদায়িক হানাহানির অতীত। এ হল বিজেপির একেবারে হোম গ্রাউন্ড...”। সেই ‘নিজস্ব জমি’কে কেন কব্জা করতে পারল না বিজেপি? কারণ, পশ্চিমবঙ্গ কখনওই তার নিজস্ব জমি নয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানিই তো পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র তথা সত্যিকারের অতীত নয়, তার সত্যিকারের অতীত নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিপ্লবী ধারা এবং দীর্ঘ বামপন্থী আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক হানাহানিটা এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের এক বিচ্যুতি। দেশভাগ দেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

নবজাগরণের, স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রভাব বাংলার মানুষের মনে যত দিন থাকবে তত দিন গেরুয়ার বঙ্গ বিজয়ের স্বপ্ন সফল হবে না। তাই বারে বারে সেই জায়গাটিতেই আঘাত আসছে। তাই তাদের সংগঠিত প্রচার যে, বাংলাভাষীমাত্রেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বাংলা ভাষাকে ‘বাংলাদেশি ভাষা’ বলাটাও কোনও অজ্ঞতা প্রসূত নয়, একই পরিকল্পনার অঙ্গ। এর মধ্য দিয়ে যেমন মুসলিমদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হল, তেমনই দেশ জুড়ে হিন্দুদের মধ্যেও সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক তৈরি করে মুসলিমবিরোধী মানসিকতাতে ইন্ধন জোগানো গেল। আবার বাংলার মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতির মনটি রয়েছে সেটিতেও আঘাত করে বিভেদের জমি প্রস্তুত করা গেল। এ ভাবে বাংলার মানুষের সাম্প্রদায়িক ঐক্য নষ্ট করে হিন্দুভোটকে একত্রিত করাই হয়তো লক্ষ্য। সঙ্গে এসআইআর-এর মাধ্যমে যদি বেছে বেছে কিছু নাম বাদ দেওয়া যায় তবে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু ভোটে কোন দল জয়ী হবে তার থেকেও বড় কথা, গেরুয়া দলটি এই প্রচেষ্টায় জয়ী হলে বাংলার মানুষের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রামের সমস্ত অর্জনকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কূপে বিসর্জন দেওয়া হবে।

সমরেন্দ্র প্রতিহার
কলকাতা-২

নির্বুদ্ধিতার বিপদ

সম্পাদকীয় ‘বর্জ্য (অ)ব্যবস্থা’ (৩-১২) পড়তে পড়তে মনে পড়ল কিছু দিন আগে প্রায় সকালেই কানে আসত গৃহস্থের সঙ্গে বর্জ্যসংগ্রাহকের উচ্চগ্রামে বাদানুবাদ। গৃহস্থরা কেউ কেউ পচনশীল ও অ-পচনশীল বর্জ্যের জন্য নির্ধারিত আলাদা রঙের বালতিতে বর্জ্য না-দেওয়ার ফলে ঝামেলায় পড়ছেন বর্জ্যগ্রাহকেরা। প্রাণপণে তাঁরা বোঝাতে চান, কর্তৃপক্ষ কেন অতিরিক্ত বালতি দিয়েছেন। দু'রকমের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য কত রকম পরিকল্পনা নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। আবছা অথবা পুরোটা জেনেও এক শ্রেণির গৃহস্থ কিছুতেই সহযোগিতা করতে চান না। খেয়াল করে দেখলাম, সম্প্রতি আর বাদানুবাদ বা গোলযোগ নেই। সম্ভবত, বর্জ্যগ্রাহক ক্ষান্ত দিয়েছেন। কিছু নাগরিককে অন্তত, সচেতনতার পাঠ দেওয়া তাঁর কর্ম নয়। সচেতনে চেতনাদান আর জাগন্তকে জাগিয়ে তোলা পৃথিবীতে দুরূহতম কর্মের মধ্যে পড়ে।

ফলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। জানা গেল, নগরজীবনে উৎপন্ন বর্জ্যের সিকিভাগেরও কম পরিকল্পনামাফিক প্রক্রিয়াকরণের ফলে কাজে লাগছে। বাকিটা ফেলা যাচ্ছে। বাড়তে-থাকা বর্জ্যপাহাড়ের ফলে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা ভয়াল হয়ে উঠছে, যে কোনও সময়ে নাগরিক জীবনে অসুখ-বিসুখের বিপর্যয় নেমে আসা বিচিত্র নয়। নির্বুদ্ধিতা ও বিবেচনার অভাব তবুও ঘোচে না।

বিশ্বনাথ পাকড়াশি
শ্রীরামপুর, হুগলি

চিঠিপত্র পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক সমীপেষু,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১।
ইমেল: letters@abp.in
যোগাযোগের নম্বর থাকলে ভাল হয়।
চিঠির শেষে পুরো ডাক-ঠিকানা উল্লেখ করুন, ইমেল-এ পাঠানো হলেও।